চরিত্রহীন

শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়

ঐতিহ্য

চরিত্রহীন

এক

পশ্চিমের একটা বড়ো শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কী একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই শহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদমর্যাদানুসারে যাহা কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সৎকর্মটা কী শুনি?

তাহারা কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহূত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিবেন এবং সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এইজন্যই।

উপেন্দ্র আর কোনো প্রশ্ন না করিয়াই রাজি হইলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এতই ভালো করিয়া পাস করিয়াছিলেন যে, ছাত্রমহলে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের অবধি ছিল না। ইহা তিনি জানিতেন। তাই, কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে তাহারা যখনই আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আবেদন ও উপরোধকে মমতায় কোনোদিন উপেক্ষা করিয়া ফিরাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে ডিঙাইয়া আদালতের লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইবার পরও ছেলেদের জিমন্যাস্টিকের আখড়া হইতে ফুটবল, ক্রিকেট ও ডিবেটিং ক্লাবের সেই উঁচু স্থানটিতে গিয়া পূর্বের মতো তাঁহাকে বসিতে হইত।

কিন্তু এই জায়গাটিতে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না—কিছু বলা আবশ্যক। একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলা চাই তো হে! সভাপতি সেজে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকা তো আমার কাছে ভালো ঠেকে না—কী বল তোমরা?

এ তো ঠিক কথা। কিন্তু তাহাদের কাহারো কিছুই জানা ছিল না। বাহিরের প্রাঙ্গণের একধারে একটা প্রাচীন পুষ্পিত জবা বৃক্ষের তলায় এই ছেলের দলটি যখন উপেন্দ্রকে মাঝখানে লইয়া সংসারের যাবতীয় সম্ভব-

অসম্ভব সৎকর্মাবলীর তালিকা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দিবাকরের ঘর হইতে একজন নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপেন্দ্র দিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। বাহিরের একটি ছোট ঘরে দিনের বেলায় তাহার লেখাপড়া এবং রাত্রে শয়ন চলিত। বয়স প্রায় উনিশ; এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছিল।

উপেন্দ্রর দৃষ্টি এই পলাতকের উপর পড়িবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, সতীশ, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস যে! এদিকে আয়—এদিকে আয়!

ধরা পড়িয়া সতীশ অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন দেখিনি যে?

অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইয়া সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতদিন এখানে ছিলাম না উপীনদা, এলাহাবাদে কাকার কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা ভালো করিয়া শেষ না হইতেই একজন ছাঁটা-দাড়ি টেরি-চশমাধারী যুবক চোখ টিপিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া বসিল, মনের দুঃখে নাকি সতীশ?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবারেও তাহাকে পাঠানো হয় নাই এ সংবাদ সকলেই জানিত, তাই কথাটা এমন বেয়াড়া বিশ্রী শুনাইল যে, উপস্থিত সকলেই লজ্জায় মুখ নত করিয়া মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। যুবকটির পরিহাস ও দাঁতের হাসি কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তখনি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সতীশ তাহার হাসিমুখ লইয়া বলিল, ভূপতিবাবু, মন থাকলেই মনে দুঃখ হয়। পাস করার আশাই বলুন আর ইচ্ছেই বলুন, আমার ভালো করে জ্ঞান হবার পর থেকেই ছেড়েছি। শুধু বাবা ছাড়তে পারেননি। তাই, মনের দুঃখে কাউকে দেশান্তরী হতে হলে তাঁর হওয়াই উচিত ছিল; অথচ তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন। কিন্তু যা বলো উপীনদা, এবারে তাঁরও চোখ ফুটেছে।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসির কথা ইহাতে ছিল না, কিন্তু এই ভূপতিবাবুর অভদ্র পরিহাস যে সতীশকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে নাই, ইহাতেই সকলে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবারে তা হলে তুই ছেড়ে দিলি?

সতীশ বলিল, আমি কী কোনোদিন ধরেছিলাম যে আজ ছেড়ে দেব? আমি কোনোদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল। এবারে আমি আত্মরক্ষা করব। এমন দেশে গিয়ে বাস করব যেখানে পাঠশালাটি পর্যন্ত নেই।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু কিছু করা তো দরকার। মানুষে একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না, পারা উচিতও নয়।

সতীশ বলিল, না, চুপ করে থাকব না। এলাহাবাদ থেকে একটা নতুন মতলব পেয়ে এসেছি। একবার ভালো করে চেষ্টা করে দেখব সেটার কী করতে পারি।

বিস্তারিত বিবরণের আশায় সকলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে সলজ্জ হাস্যে বলিল, আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া, তেমনি ওলাউঠা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে সময়ে হয়ত একজনও ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমি সেইখানে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে দেব। আমার মা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে হাজার-কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে। ঐ দিয়ে আমাদের দেশের বাড়ির বৈঠকখানাঘরে ডিসপেনসারি খুলে দেব। তুমি হেসো না উপীনদা, তুমি নিশ্চয় দেখো, এ আমি করব। বাবাকেও সম্মত করেছি। তাঁকে বলেছি, মাস-খানেক পরেই কলকাতা গিয়ে হোমিওপ্যাথি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস-খানেক পরে কেন?

সতীশ বলিল, একটু কাজ আছে। দক্ষিণপাড়া নবনাট্যসমাজ ভেঙে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে, আমাদের বিপিনবাবু হয়েছেন ওই দলের কর্তা। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করে তিনিই আমাকে এনেছেন, আমি কথা দিয়েছি তাঁদের কনসার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

শুনিয়া সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সতীশও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উচ্চহাসি মৃদু হইয়া আসিলে সতীশ বলিল, একটা বাঁশির অভাব হচ্ছে, সেইজন্যেই আজ দিবাকরের কাছে এসেছিলাম। যদি থিয়েটারের রাতটায় আমাকে উদ্ধার করে দেয় তো আর বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কী বলে ও?

সতীশ বলিল, আর কী বলবে—পরীক্ষা সন্নিকট। এটা আমার মাথাতে ঢোকে না উপীনদা, দুই বছরের পড়াশুনার পরীক্ষা কেমন করে লোকের একটা রাতের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। আমি বলি, যাদের সত্যিই যায় তাদের যাওয়াই উচিত। এমন পাস করার মর্যাদা যাদের কাছে থাকে থাক আমার কাছে তো নেই। তুমি রাগ করতে পারবে না উপীনদা, আমি তোমাকে যত জানি এঁরা তার সিকিও জানেন না। জিমন্যাস্টিকের আখড়া থেকে ফুটবল

ক্রিকেটে চিরদিন তোমার সাকরেদি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অনেকদিন অনেক রকমেই তোমার সময় নষ্ট হতে দেখেছি, অনেকগুলো পরীক্ষা দিতেও দেখলাম, সেগুলো রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাস করতেও দেখলাম, কিন্তু কোনোদিন তোমাকে তো একজামিনের দোহাই পাড়তে শুনলাম না।

উপেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, আমি যে বাঁশি বাজাতে জানিনে সতীশ।

সতীশ বলিল, আমিও অনেক সময়ে ওই কথাই ভাবি। সংসারের এই জিনিসটা কেন যে তুমি জানলে না, আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সে কথা যাক—তোমাদের দুপুর রোদের এ কমিটিটি কিসের?

শীতের রৌদ্র পিঠে করিয়া মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছিল। বেলা যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই নজর করে নাই। সতীশের কথায় বেলার দিকে চাহিয়া সকলেই এককালে চিন্তিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাভঙ্গের মুখে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু তা হলে?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি তো বলেছি, আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের স্বামীজির উদ্দেশ্যটা যদি পূর্বাহ্নে একটু জানা যেত তো ভারি স্বস্তি পেতাম। নিতান্ত বোকার মতো কোথাও যেতে বাধবাধ ঠেকে।

ভূপতি কহিল, কিন্তু কোনো কথাই তিনি বলেন না। বরং এমনও বলেন, যাহা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাহা বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার সময় ও সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত একেবারে না বলাই ভালো। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলে।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। এতক্ষণে সকলেই বাহির হইয়া রাস্তার একধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কী উপীনদা?

উপেন্দ্রকে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, সতীশবাবু, আপনাকেও চাঁদার খাতায় সই করতে হবে। কেন, এখন আমরা ঠিক করে বলতে পারব না। পরশু অপরাহ্নে কলেজের হলে স্বামীজি নিজেই বুঝিয়ে বলবেন।

সতীশ বলিল, তা হলে আমার বোঝা হল না ভূপতিবাবু। পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল—আমি অনুপস্থিত থাকলে চলবে না।

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি সতীশবাবু! থিয়েটারের সামান্য ক্ষতির ভয়ে এরূপ মহৎ কাজে যোগ দেবেন না? লোকে শুনলে বলবে কী?

সতীশ কহিল, লোকে না শুনেও অনেক কথা বলে—সে কথা নয়। কথা আপনাদের নিয়ে। কিছু না জেনেও এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা যতটা মহৎ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, আমি যদি ততটা না পারি তো আমাকে দোষ দেবেন না। বরং যা জানি, যার ভালোমন্দ কিসে হয় না হয় বুঝি, সেটা উপেক্ষা করে, তার ক্ষতি করে একটা অনিশ্চিত মহত্ত্বের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমার কাছে ভালো ঠেকে না।

উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বয়সে এবং লেখাপড়ায় ভূপতিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। সতীশের কথায় হাসিয়া বলিলেন, সতীশবাবু, স্বামীজির মতো মহৎ ব্যক্তি যে ভালো কথাই বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে ভালোই হবে, এ বিশ্বাস করা তো শক্ত নয়।

সতীশ বলিল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে শক্ত নয় মানি। এই দেখুন না, এন্ট্রান্স পাস করাও শক্ত কাজ নয়, অথচ, পাস করা দূরে থাক, তিন-চার বছরের মধ্যে আমি তার কাছে ঘেঁষতে পারলাম না। আচ্ছা, এই স্বামীজি লোকটিকে পূর্বে কখনও দেখেছেন কিংবা এঁর সম্বন্ধে কোনোদিন কিছু শুনেছেন?

কেহই কিছু জানে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিল।

সতীশ বলিল, এই দেখুন, এক গেরুয়া বসন ছাড়া আর তাঁর কোনো সার্টিফিকেট নেই। অথচ আপনারা মেতে উঠেছেন এবং আমি নিজে কাজ ক্ষতি করে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারিনে বলে সবাই রাগ করছেন।

ভূপতি বলিল, মেতে উঠি কি সাধে সতীশবাবু! এই গেরুয়া কাপড়-পরা লোকগুলি সংসারকে যে অনেক জিনিসই দিয়ে গেছেন। সে যাই হোক, আমি রাগ করিনি, দুঃখ করছি। জগতের সমস্ত বস্তুই সাফাই সাক্ষীর হাত ধরে হাজির হতে পারে না বলে মিথ্যা বলে ত্যাগ করতে হলে অনেক ভালো জিনিস হতেই আমাদের বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। আপনিই বলুন দেখি, যখন সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা সাধতেন, তখন কতটুকু রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন? কতটুকু ভালোমন্দ তার বুঝেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। সঙ্গীতের একটা আদর্শ যদি আমার সুমুখে না থাকত, মিষ্ট রসাস্বাদের আশা যদি না করতাম, তা হলে এত কষ্ট করে সা-রে-গা-মা সাধতাম না। ওকালতির মধ্যে টাকার গন্ধ আপনি যদি অত করে না পেতেন, তা হলে একবার ফেল করেই ক্ষান্ত দিতেন, বারংবার এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করে আইনের বইগুলো মুখস্থ করতেন না। উপীনদাও হয়ত একটা ইস্কুল-মাস্টারি নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতেন।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একগুণ খোঁচা যে দশগুণ করিয়া সতীশ ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল।

রোষ চাপিয়া রাখিয়া ভূপতি কহিলেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। একটা জিনিসের ভালোমন্দ যে কত রকমে প্রমাণ হতে পারে, তাই হয়ত আপনি জানেন না।

কথায় কথায় সকলেই ক্রমশ রাস্তার একধারে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মাপ করুন ভূপতিবাবু! ছয় রকম 'প্রমাণ' ও ছত্রিশ রকম 'প্রত্যক্ষে'র আলোচনা এত রোদে সহ্য হবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যার পর বাবার বৈঠকখানায় যাবেন, যেখানে দুপুর-রাত্রি পর্যন্ত কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে। প্রফেসার নবীনবাবু, সদর-আলা গোবিন্দবাবু, মায় এ বাড়ির ভট্টাচায্যিমশায় পর্যন্ত এই নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চুলোচুলি করতে থাকেন। পাশের ঘরেই আমার আড্ডা। হেরফেরগুলো বেশ কায়দা করে এখনও পেকে উঠেনি বটে, কিন্তু গায়ে আমার রং ধরেচে। অসময়ে পেকে গাছতলায় পড়ে শিয়াল-কুকুরের পেটে যেতে চাইনে। তাই, এটা বাদ দিয়ে আর কিছু যদি বলবার থাকে তো বলুন, না হয় অনুমতি করুন, বিদায় হই।

যুক্তহস্ত সতীশের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। রুষ্ট ভূপতি দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় তর্কের সূত্র হারাইয়া গেল এবং এমন অবস্থায় যাহা প্রথমেই মুখে আসে তাহাই তর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আপনি তা হলে দেখছি ঈশ্বরও মানেন না।

কথাটা যে নিতান্তই অসংলগ্ন ও ছেলেমানুষের মতো হইল, তাহা ভূপতির নিজের কানেও ঠেকিল।

সতীশ ভূপতির আরক্ত মুখের উপরে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উপেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও উপীনদা, ভূপতিবাবু এবারে কোণ নিয়েচেন। আমার মতো দশ-বারোটা কুকুরেও এবারে আর ঘেঁষতে পারবে না। ভূপতির প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক করেছেন ভূপতিবাবু, 'চোর-চোর' খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলাই ভালো।

এই অপবাদের আঘাতে আগুন হইয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি চুপ কর ভূপতি, আমি এই লোকটিকে জব্দ কচ্ছি। বুড়ি ছোঁয়া, কোণ নেওয়া, এ সব কী কথা রে সতীশ? বাস্তবিক তোর যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতি, তাতে সন্দেহ হতেই পারে, তুই ঈশ্বর পর্যন্ত মানিসনে।

সতীশ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, হাঁ অদৃষ্ট! ঈশ্বর মানিনে? ভয়ঙ্কর মানি। থিয়েটারের আড্ডা ভাঙবার পরে দুপুর-রাত্রে গোরস্থানের পাশ দিয়ে একলা ফিরবার পথে যখন বিশ্বাসের জোরে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়, তোমরা ভালোমানুষের দল তার কী খবর রাখ? হাসছ কী উপীনদা, ভূত-প্রেত মানি, আর ঈশ্বর মানিনে?

তাহার কথায় ক্রুদ্ধ ভূপতি পর্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সতীশবাবু, ভূতের ভয় করলেই ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—এ দুটি কি তবে আপনার কাছে এক?

সতীশ বলিল, একেবারে এক। পাশাপাশি রাখলে চেনবার জো নেই। শুধু আমার কাছেই নয়, আপনার কাছেও বটে, উপীনদার কাছেও বটে, এবং যাঁরা শাস্ত্র লেখেন তাঁদের কাছেও বটে। ও এক কথাই। না মানেন তো বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু মানলে আর রক্ষা নেই। দায়ে-ঘায়ে, আপদে-বিপদে, অনেক তরফ দিয়ে অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, বাগবিতণ্ডাও বিস্তর শুনেছি, কিন্তু যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। ছোট একটুখানি নিরাকার ব্রহ্মই মানো, আর হাত-পা-ওয়ালা তেত্রিশ কোটি দেবতাই স্বীকার করো, কোনো ফন্দিই খাটে না। সমস্ত এক শিকলে বাঁধা। একটিকে টান দিলেই সব এসে হাজির হবে। ওই স্বর্গ-নরক আসবে, ইহকাল-পরকাল আসবে, অমর আত্মা এসে পড়বে, তখন কবরস্থানের দেবতাগুলিকে ঠেকাবে কী দিয়ে? কালীঘাটের কাঙালির মতো? সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও! নিমেষের মধ্যে যে যেখানে আছেন এসে ঘিরে ধরবেন। ঈশ্বর মানি, আর ভূতের ভয় করিনে—সে হবার জো নেই ভূপতিবাবু!

যেরূপ ভঙ্গি করিয়া সে কথার উপসংহার করিল তাহাতে সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত লঘুবয়স্ক দুইজন বালকের হাস্য-কোলাহলে রবিবারের অলস মধ্যাহ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর স্ত্রী সুরবালার প্রেরিত যে চাকরটা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বিড়বিড় করিতেছিল, সে পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কলহের যে মেঘখানা ইতিপূর্বে আকার ধারণ করিতেছিল, এই সমস্ত হাসির ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল তাহার উদ্দেশ রহিল না।

কেহই হুঁশ করিল না, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণে বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঝির দল উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও রান্নাঘরে বামুনঠাকুরেরা কর্মত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃপুন ঘোষণা করিয়া দিতেছে।

দুই

মাস-তিনেক পরে কলিকাতার একটা বাসায় একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙিয়া সতীশ বিছানায় এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে হঠাৎ স্থির করিয়া বসিল, আজ সে স্কুলে যাইবে না। সে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িতেছিল। এই কামাই করিবার সঙ্কল্পটা তাহার মনের মধ্যে সুধা বর্ষণ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে বিকল দেহটাকে সবল করিয়া তুলিল। সে প্রফুল্ল মুখে উঠিয়া বসিয়া তামাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিল সাবিত্রী। সে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙলো বাবু?

সাবিত্রী বাসার ঝি এবং গৃহিণী। চুরি করিত না বলিয়া খরচের টাকাকড়ি সমস্তই তাহার হাতে। একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট-দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহসুখ-বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্তরিক স্নেহ-মমতা ছিল। অথচ, কেহ সুখ্যাতি করিলে বলিত, যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু! তাছাড়া, বাড়ি গিয়ে গিন্নিদের কাছে নিন্দে করে বলবেন, বাসার এমন ঝি যে, পেট ভরে দুবেলা খেতেও দেয় না—ও অপযশের চেয়ে একটু খাটা ভালো, বলিয়া হাসিমুখে কাজে চলিয়া যাইত। বাসার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন-তখন বকশিশ দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারা দিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বোধ করি এইজন্যই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বাসার সকলেই ইহা জানিত, এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জবাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।

সতীশ কহিল, হাঁ, ঘুম ভাঙলো। বলিয়াই বালিশের তলা হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাবিত্রী টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, সকালবেলায় আবার কী আনতে হবে?

সতীশ বলিল, সন্দেশ! কিন্তু আমার জন্যে নয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জন্যে কিনে নিয়ে যেও।

সাবিত্রী রাগ করিয়া টাকাটা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, রেখে দিন আপনার টাকা। আমার বাবু সন্দেশ খেতে ভালোবাসে না।

সতীশ টাকাটা পুনরায় ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, আমার মাথা খাও সাবিত্রী, এ টাকা আমাকে কিছুতেই ফিরুতে পারবে না, আমি সত্যি তোমার বাবুকে সন্দেশ খেতে দিয়েছি।

সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, যখন-তখন আপনি মেয়েমানুষের মতো মাথার দিব্যি দেন, এ ভারি অন্যায়। বাবু-টাবু আমার নেই। বাবু আমার আপনি—আপনারা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও টাকা। কিন্তু বলো, আমরা ছাড়া যদি আর কোনো বাবু থাকে তো তার মাথা খাই।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমার বাবু কী আপনার সতীন যে, মাথা খাচ্ছেন?

সতীশ কহিল, আমি তাঁর মাথা খাচ্ছি, না তিনি আমার খাচ্ছেন? আমি তো বরং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি!

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চাকর-দাসীর সঙ্গে এ-রকম করে কথা কইলে ছোটলোক প্রশ্রয় পেয়ে যায়, আর মানে না, একটু বুঝে সমঝে কথা কইতে হয় বাবু, নইলে লোকেও নিন্দা করে। বলিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ এ বেলা কী রান্না হবে?

রন্ধনশালা সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সতীশ যে একজন গুণী লোক সে পরিচয় সাবিত্রী পূর্বেই পাইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ সকালবেলা একবার করিয়া আসিয়া সতীশের হুকুম লইয়া যাইত, এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বামুনঠাকুরের দ্বারা সমস্তটুকু নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করাইয়া লইত। ইতিমধ্যে চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, সতীশ আর একবার কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, যা খুশি।

সাবিত্রী বলিল, আবার রাগও আছে যে!

সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিল, পুরুষমানুষ, রাগ থাকবে না? আজ আমি খাবও না।

সাবিত্রী বলিল, আর কোথাও জুটেছে বোধ হয়? কিন্তু সে যাই হোক সতীশবাবু, ইস্কুলে আপনাকে যেতেই হবে তা বলে রাখছি।

এই অল্পকালের মধ্যেই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ব্যাপারটা পুনরায় সতীশকে বোঝার মতো চাপিয়া ধরিতেছিল, এবং নানা ছলে নানা উপলক্ষে সে যে কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল, সাবিত্রী তাহা লক্ষ করিয়া দেখিতেছিল। আজ সেই ছলনার পুনরাবৃত্তির সূত্রপাতেই সে টের পাইল।

সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, শুভকর্মের গোড়াতেই টুকো না বলচি।

সাবিত্রী কহিল, তা তো বললেন। কিন্তু এন্ট্রান্স পাস করতে চব্বিশ বছর কেটে গেল, এই ডাক্তারি পাস করতে চৌষট্টি বছর কেটে যাবে যে!

সতীশ রাগতভাবে বলিল, মিথ্যা কথা বলো না সাবিত্রী। আমি এন্ট্রান্স পাস করিনি।

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটাও করেননি?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। হিংসুটে মাস্টারগুলো আমাকে পাস করতে যেতেই দেয়নি।

সাবিত্রী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিল, তবে এটা হবে কি?

কোনটা?

এই ডাক্তারিটা?

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাবিত্রী, গাধার মতো লোকগুলো একজামিন-পাস করে কি করে বলতে পার?

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, গাধার মতন, কিন্তু গাধা নয়। যারা ঠিক গাধা, তারা পারে না।

সতীশ ব্যস্তভাবে দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই স্থির হইয়া বসিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, কেউ যদি শোনে তো সত্যিই নিন্দে করবে। আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গাধা বলছ, এর কোনো কৈফিয়তই দেওয়া চলবে না।

হায় রে! কর্মদোষে আজ সাবিত্রী বাসার দাসী! তাই সে এই আঘাতটুকু সহ্য করিয়া লইয়া বলিল, তা বটে! বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ আর একবার অলসের মতো বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনের মধ্যে কর্মহীন সারা দিনের যে ছবিটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রীর কথার ঘায়ে তাহার অনেকটাই মলিন হইয়া গেল এবং যে ব্যথাটুকু বহন করিয়া সাবিত্রী নিজে চলিয়া গেল, তাহাও তাহার ছুটির আনন্দকে বাড়াইয়া দিয়া গেল না, এবং যদিচ সে মনে মনে বুঝিল আজ আর কামাই করিয়া লাভ হইবে না, তত্রাচ কিছুই না করিবার লোভও সে ত্যাগ করিতে না পারিয়া অলস

বিরক্ত মুখে বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু যথাসময়ে স্নানের জন্য তাগিদ পড়িল। সতীশ উঠিল না; বলিল, তাড়াতাড়ি কী? আমি আজ তো বার হব না।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সে হবে না। আপনাকে ইস্কুলে যেতেই হবে—যান, আপনি স্নান করে খেয়ে নিন।

সতীশ বলিল, তোমাকে কি আমার অছি বহাল করা হয়েছে যে, এমন করে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছ? আজ আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

সাবিত্রী একটুখানি হাসিল; বলিল, না যান তো স্নান করে খেয়ে নিন। আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায় সেটা দেখতে পান না?

সতীশ বলিল, এ কী রকম দাসী-চাকর যে নটা বাজতে না বাজতে কষ্ট পায়! না—এ বাসা আমাকে বদলাতেই হবে, না হলে শরীর টিকবে না দেখচি।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, তা হলে আমাকেও বদলাতে হবে। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের কথাটা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ততক্ষণ কিন্তু আপনাকে এই বাসার নিয়মই মেনে চলতে হবে—ইস্কুলেও যেতে হবে। নিন, উঠুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে। বলিয়াই সতীশের ধুতি ও গামছা স্নানের ঘরে রাখিয়া আসিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিত। আজ সে স্নান করিয়া আসিয়া পূজার আসনে বসিয়া দেরি করিতে লাগিল। সাবিত্রী দুই-তিনবার আসিয়া দেখিয়া গিয়া দরজার বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, আর কেন, বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! ইস্কুলে যেতে হবে না আপনাকে, দয়া করে দুটি খেয়ে নিয়ে আমাদের মাথা কিনুন।

সতীশ আরও মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পূজা-আহ্নিকের সময় গোলমাল করলে কী হয় জানো?

সাবিত্রী বলিল, কোশাকুশি সামনে নিয়ে ছল করলে কী হয় জানেন?

সতীশ চোখ কপালে তুলিল, ছল করছিলাম! কখখন না।

সাবিত্রী কী একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। তারপরে বলিল, তা আপনিই জানেন। কিন্তু আপনারও তো অন্যদিন এত দেরি হয় না—যান, ভাত দেওয়া হয়েছে; বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ শীতের মধুর মধ্যাহ্নে বাসা নির্জন ও নিস্তব্ধ। এ বাসার সকলেই কেরানি। তাঁহারা অফিসে গিয়াছেন। বামুনঠাকুর বেড়াইতে গিয়াছে, বেহারী বাজার করিতে গিয়াছে, সাবিত্রীরও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সতীশ নিজের ঘরে প্রথমে দিবানিদ্রার মিথ্যা চেষ্টা করিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিয়া যা-

তা ভাবিতেছিল। তাহার শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। সেটা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের খোলা ছাদের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ফেলিল। ছাদের একপ্রান্তে বসিয়া সাবিত্রী চুল শুকাইতেছিল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী একটা বই দেখিতেছিল। জানালা খোলা-দেওয়ার শব্দে সে চকিত হইয়া মাথার উপরে আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনতিকাল পরেই সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, ডাকছিলেন আমাকে?

সতীশ বলিল, না, ডাকিনি তো।

আপনার পান, জল আনব?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আনো।

সাবিত্রী পান, জল আনিয়া বিছানার কাছে রাখিয়া দিয়া, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা একে একে বেশ করিয়া খুলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়াই বলিল, যাই, আপনার তামাক সেজে আনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী কোথায়?

বাজারে গেছে, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিয়া খোলা দরজার সুমুখে বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আজ মিথ্যে কামাই করলেন।

সতীশ কহিল, এইটেই সত্যি! আমার ধাতটা কিছু স্বতন্ত্র, তাই মাঝে মাঝে এ রকম না করলে অসুখ হয়ে পড়ে। তাছাড়া আমি রীতিমত ডাক্তার হতেও চাইনে। অল্প-স্বল্প কিছু কিছু শিখে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়ে একটা বিনি-পয়সার ডাক্তারখানা খুলে দেব। চিকিৎসার অভাবে দেশের গরিব-দুঃখীরা ওলাউঠায় উজাড় হয়ে যায়, তাদের চিকিৎসা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সাবিত্রী বলিল, বিনি-পয়সার চিকিৎসায় বুঝি ভালো শেখার দরকার নেই? ভালো ডাক্তার কেবল বড়োলোকের জন্যে, আর গরিবের বেলাই হাতুড়ে। কিন্তু তাই বা হবে কী করে? আপনি চলে গেলে বিপিনবাবুর ভারি মুশকিল হবে যে!

বিপিনবাবুর উল্লেখে সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, মুশকিল আবার কী, আমার মতো বন্ধু তাঁর ঢের জুটে যাবে। তাছাড়া, ওখানে আমি আর যাইনে!

সাবিত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল, যান না? তা হলে আর ওঁকে গান-বাজনা শেখায় কে?

সতীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, গান-বাজনা বুঝি আমি শেখাই?

সাবিত্রী বলিল, কী জানি বাবু, লোক তো বলে।

কেউ বলে না—এ তোমার বানানো কথা।

আপনাকে বিপিনবাবুর মোসাহেব বলে; এও বুঝি আমার বানানো কথা।

কথা শুনিয়া সতীশ আগুন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ ছিল। বিপিনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাহিরের লোকের সমালোচনার বিষয় হইলে সেই সমালোচনার ফল সাধারণত কী দাঁড়ায়, ইহা সে বিদিত ছিল। কলিকাতাবাসী বিপিনের সাংসারিক অবস্থা ও তাহার আমোদ-প্রমোদের অপর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জামের মাঝখানে প্রবাসী সতীশের স্থানটা লোকের চোখে যে নীচে নামিয়াই পড়িবে, সতীশের অন্তরঙ্গ এই উৎকণ্ঠিত সংশয় সাবিত্রীর তীক্ষ্ণ ঘায়ে একেবারে উগ্রমূর্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে দুই চোখ দীপ্ত করিয়া গর্জিয়া উঠিল, কী, আমি মোসাহেব—কে বলে শুনি?

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, কার নাম করব বাবু? যাই, রাখালবাবুর বিছানাটা রোদে দিয়ে আসি।

বিছানা থাক—নাম বল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, কুমুদিনী।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, তাকে তুমি জানলে কী করে?

সাবিত্রী বলিল, তিনি আমাকে কাজ করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমাকে? সাহস তো কম নয়! তুমি কী বললে?

এখনো বলিনি—ভাবচি। বেশি মাইনে, কম কাজ, তাই লোভ হচ্চে।

সতীশের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল, এ বিপিনের মতলব। তোমার নাম সে প্রায়ই করে বটে।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, করেন? তা হলে বোধ করি আমাকে মনে ধরেছে!

সতীশ সাবিত্রীর মুখের প্রতি ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, ধরাচ্ছি; একশো টাকা ফাইন দিয়ে অবধি লোকজনকে আর চাবকাইনি—আবার দেখছি কিছু দিতে হল! আচ্ছা, তুমি যাও।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। রাখালের বিছানাগুলি রৌদ্রে দিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, সতীশ জামা গায়ে দিয়াছে, এবং বাক্স খুলিয়া একতাড়া নোট লুকাইয়া পকেটের মধ্যে লইতেছে। সাবিত্রী দুই চৌকাঠে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কোথায় যাওয়া হবে?

কাজ আছে—পথ ছাড়ো।

কী কাজ শুনি?

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সরো।